॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভূমিকা

মালদহের একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস এই জেলার ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। সেই প্রাচীন পাল ও সেনযুগের শেষ থেকে শুরু করে মুসলমানী আমল, ইংরেজ যুগ এবং তারপরের স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মালদহ জেলার উপর দিয়ে বিভিন্নযুগে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে। শিল্পের যদি ভাষার দিক থেকে এই জেলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যায় তাহলে দেখব একদিকে যেমন সেই প্রাচীন পালযুগ থেকে বাংলাভাষার মুখ্যধারাটি প্রবাহিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভাষার আগমন ঘটেছে। এই সমস্ত আগত ভাষাগুলি স্থানীয় কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বাংলাভাষার সঙ্গে মিলে মিশে এক নতুন সৃষ্টি করেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব আগন্তুক ভাষাগুলি মূলত অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। আমাদের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় পারম্পর্যের ঐতিহ্যসূত্রে পাল এবং অঞ্চলবিশেষে মুসলিম মালদহের কথ্যভাষা সমূহের মূল ও বৃত্তির বিশ্লেষণ। এই জেলায় বাংলা ভাষার পাশাপাশি যে সব কথ্যভাষাগুলি প্রচলিত আছে সেই সব কথ্যভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে বর্তমানে তথ্য সংগ্রহমূলকভাবে সেই সব ভাষাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি দেখাবার চেষ্টা করা হবে। আমরা এই গবেষণার জন্য প্রচলিত আর্য কথ্যভাষার মূল ও বৃত্তির সঙ্গে মালদহী কথ্যভাষার মূল ও বৃত্তির সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এবং মৌলিক পার্থক্যগুলি দেখিয়ে দেওয়া।

প্রসঙ্গত এ কথা বলা প্রয়োজন যে ভাষা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসেবে কথ্য ভাষা (Spoken Languages) যদিও বর্তমানে চলিতভাষার মানে দাঁড়িয়েছে বাংলা ভাষার একটা সাধারণ মূল হিসেবে এককেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে — (বিশেষত শিক্ষিত লোকের মুখে এবং সাহিত্যের ভাষার মাধ্যম হিসেবে) তথাপি এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাগুলি নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা হয় নি। সেই দিক থেকে মালদহ জেলার কথ্যভাষার মূল ও বৃত্তি নিয়ে আলোচিত এই গবেষণার কাজ একটা মূলত্ব বৈশিষ্ট্য দাবী করবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কোন না কোন ভাবে এই আঞ্চলিক কথ্যভাষা-গুলির সঙ্গে চলিতভাষার একটা যোগসূত্র আছে। আবার এ কথাও অস্বীকার করা যায় না

যে এই আঞ্চলিক কথ্যভাষাগুলি অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এই সব ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তির দিয়ে এই স্বাতন্ত্র্য সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যখন হয়ত চলিত ভাষা বা হয় বা হয় এই সমস্ত – আঞ্চলিক ভাষাকে গ্রাস করে শেষ পর্যন্ত সর্বত্র সাধারণের ভাষা হয়ে উঠবে এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়ত বা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক ভাষাগুলির অস্তিত্ব খুঁজে কষ্ট করে পড়বে। এই বিশেষ দিকটির দিকে লক্ষ্য রেখে আঞ্চলিক কথ্যভাষাগুলির একটা আলোচনা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে একথা আর আমরা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি যে আঞ্চলিক জীবনের স্বভাব ক্রমশঃই গ্রামীণ জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। যা ছিল আটপৌরের ভাষা – নিতান্তই ঘরের এবং আমলের – শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলের মানুষ আজ সেই ঘরের ভাষাকে বিদায় দিতে দিতেছে। আঞ্চলিক জীবনের ধাঁচে নিজেরা শিক্ষিত হবার ভাষাকে একরকম জোর করে চালু করতে গিয়ে ঘরোয়া পরিবেশের ভাষা আজ বিস্তৃতির অন্ধকারে হারিয়ে চলেছে।

একটা সময় হয়ত আসবে যখন শহর ও গ্রামের পার্থক্য আর বিশেষ থাকবে না – সেই অবস্থায় চলিতভাষার রূপটি সাধারণভাবে গৃহীত হবে। এদিক লক্ষ্য রেখে আঞ্চলিক ভাষাগুলির রূপগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করি। সুলভঃ এই কারণেই এবং এদিকে লক্ষ্য রেখেই এই গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়েছি। মালদহ জেলার পাঁচটি মহকুমার মধ্যে একটি মহকুমা। এই মহকুমারই প্রাচীন নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। মালদহের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করতে হলে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেওয়া আবশ্যক হবে বা। এই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে তপনকারী করতোয়া নদী। বিশেষজ্ঞরা বলেন করতোয়া ছিল প্রাচীন মিহোতা নদীর একটি ধারা। পুণ্ড্রবর্ধন এবং কামরূপ ছিল মধ্যে দুইটি ধারার নাম, কিন্তু জলপাই-গুড়ি জেলায় এখনও বয়ে চলেছে। এই মিহোই প্রাচীন মিহোতা।

একটা সময় নদীটি বয়ে গিয়েছে যাতে কারবার বাণিজ্যের উপযোগিতা। বাণিজ্যের কারণ হোক, জীবনযাত্রার মৌল প্রয়োজনের তাগিদে হোক লোকসমাগম হতে থাকে। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের সঙ্গে বাণিজ্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক ছিল বহু নদীর। মিহোতা ছাড়া আরও যে সমস্ত নদীর সঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধনের যোগাযোগ ঘটে তার মধ্যে প্রধান ছিল কৌশিকী নদী। প্রাচীন কৌশিকী আজকের কুশী। কুশী এখন উত্তরবিহারের। পুণ্ড্রবর্ধনে যখন ছিল পুণ্ড্রজিৎ সম্প্রদায়ের। এদের বেশির ভাগই

ছিল পরে যা হয়েছে কৌটি ব্যবসায়ী। এক সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন বলতে বর্তমান বাংলার পুরো উত্তরাঞ্চলকেই বোঝাত। পুণ্ড্রবর্ধন ছিল পুণ্ড্রদেশের রাজধানী।

বর্তমান মালদহের যে ভৌগোলিক পরিচয় পাই তা কিন্তু প্রাচীনকালে এরকম ছিল না। বলা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে মালদহ জেলার সৃষ্টি।[১] পূর্বে ছিল রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত, পরে হয়েছে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত। বর্তমান মালদহের কিছু পূর্ণিয়া, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের কিছু কিছু অংশের সমন্বয়ে সৃষ্ট। যে ভৌগোলিক সংস্থানে মালদহের অবস্থিতি এবারে তার একটা বিবরণ দেওয়া যাক।

মালদহের উত্তরে বিহার প্রদেশের কিছু অংশ এবং পশ্চিমে দিনাজপুর জেলা। পূর্বদিকে রাজশাহী জেলা। রাজশাহী বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। জেলার দক্ষিণদিকে অবস্থিত পদ্মা নদীও বাংলাদেশের অন্তর্গত। পূর্বে দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা। পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলা। পূর্ণিয়া বর্তমানে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত।

স্বাধীন ভারতবর্ষের আগে মালদহ জেলায় মোট ১৫টি থানা ছিল। তারমধ্যে পাঁচটি থানা বর্তমানে বাংলাদেশে পড়েছে। সেই পাঁচটি থানা হল শিবগঞ্জ, ভোলাহাট নাচোল, গোমস্তাপুর এবং নবাবগঞ্জ। এই পাঁচটি থানা বাদে মালদহে বর্তমানে যে দশটি থানা আছে সেগুলি হল (১) ইংরেজ বাজার, (২) মালদহ, (৩) ওল্ডমালদা, (৪) হরিশ্চন্দ্রপুর (৫) বামনগোলা, (৬) হবিবপুর, (৭) রতুয়া, (৮) মানিকচক, (৯) কালিয়াচক (১০) হরিশ্চন্দ্রপুর।

মহাভারতে এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং বঙ্গদেশের উল্লেখ পাই। আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখ করা যায় যে বর্তমান উত্তরবঙ্গই ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গ ছিল প্রাচীন সুহ্মদেশ এবং বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল প্রাচীন বঙ্গদেশ।

পুণ্ড্রবর্ধনের খ্যাতি তখন শুধু বাংলার নয় ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই দেখি সুদূর চীন দেশ থেকে হিউয়েন-সাং পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছেন। করতোয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে দার্জিলিঙ এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে। পরে মহানন্দা এবং পুনর্ভবা নদীর মধ্যবর্তী দোআঁশের ভিতর দিয়ে করতোয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুতরাং এই

---

১. ১ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

সমুদ্র নদীপথে প্রাচীন ঘোড়ার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক পণ্য আদান প্রদান হত – একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না।

পুণ্ড্রবর্ধন নগর হিসেবে প্রাচীনকালেতে ঐতিহ্য সম্পন্ন নগর বলে চিহ্নিত করা যায়। ধর্মশাস্ত্রকার আচার্য মনু তাঁর মনুসংহিতা ধর্মগ্রন্থে পুণ্ড্রজাতিকে পতিত ক্ষত্রিয় বলে – অভিহিত করেছেন। মনুসংহিতায় মনু ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে যে সব অঞ্চলের কথা উল্লেখ – করেছেন পুণ্ড্রবর্ধন তারমধ্যে স্থান পায় নি।[২] পুণ্ড্ররা বেদবিহিত আচার, অনুষ্ঠান এবং ধর্মকর্ম পালনের কঠোরবিধি মেনে চলার পক্ষপাতী ছিল না। পরাশর স্মৃতি এবং – যোগিযাজ্ঞ ধর্মগ্রন্থে এমনও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে পুণ্ড্রদেশে গমন করলে গমনকারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তবে একথা ঠিক পুণ্ড্ররা বিদ্বেষী ছিল না। যুদ্ধ, রাজনীতি কিম্বা নরহত্যা করে তারা জীবিকানির্বাহ করত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রএসমস্ত এমন সাক্ষ্য ও দেয় নি। পাণ্ডবরা পুণ্ড্রজনপদকে পরাজিত করেন। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে।

বর্তমান আলোচনায় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত বলে পুণ্ড্রবর্ধনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। এবার আলোচনার প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সঙ্গে যে নামটি জড়িত সেই ঘোড় সম্বন্ধে আলোচনা করব।

একালে, আলোচ্য অঞ্চলের অন্তর্গত উত্তরের বালুর শহরের অবস্থিতির দক্ষিণ-পূর্বের / দিকে সন্নিকটে অবস্থিত, ঘোড় ছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী। অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে, শিল্প – বাণিজ্যে, ভাস্কর্যে, চারুকলায়, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যবসতিতে ঘোড় তখন উন্নতির চরমশীর্ষে। পলাশীর কাশীমা যখন ঘোড় প্রত্যক্ষ করেছে তখন উদ্যান – পতন, পতন – অভ্যুদয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে ঘোড়ের অবস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও ইতিহাসের পাতায় ঘোড় স্থান করে নেয় তত পরাক্রান্ত হয়ে। এই পরাক্রান্ত মধ্যভাগে ঘোড় একটি উন্নতিশীল এবং আকর্ষণীয় নগরপদ রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে।

প্রাচীন কাব্য সাহিত্যগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ঘোড়ের উল্লেখ থাকলেও ঘোড়ের অবস্থিতি ঠিক কোথায় ছিল এ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাই না। একেবারে –

---

২. " মুখ্যেভ্যস্তু মনুষ্যাস্তু পক্ষিণাঃ মৃগজেবরাঃ।
এষু ব্রহ্মর্ষিদেশেষু ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ।

মনুসংহিতা / ২য় অধ্যায় / শ্লোক ১৯।

ত্রয়োদশ শতকের জৈনগ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া গেল যে পদ্মাবতী গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। তবে সমস্ত গৌড় বলতে কেবল মালদহকেই বোঝাত না — মুর্শিদাবাদ বীরভূমের কিছু অংশ এবং বর্ধমানেরও কিছু অংশ গৌড়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন গৌড়ের অবস্থিতি সম্বন্ধে বিদ্বানের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"গৌড় রাজ্য যখন প্রথম গঠিত হয় তখন ইহার সীমা যে কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবতঃ প্রথম অবস্থায় শুধু মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম ছিল এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত। পরে মালদহ এবং সম্ভবত বর্ধমানও ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাচীন বাংলার গৌড়ের পালরাজত্বের চরমোৎকর্ষের সময়ে গৌড়ের সীমা দক্ষিণদিকে উৎকল ও কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পালরাজত্বের চরমোৎকর্ষের সময়েই গৌড় নামটি বাংলার রাজাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে। এই জন্যই দেখিতে পাই পালি ও সেন রাজগণ বিভিন্নদেশে গৌড়েশ্বর, গৌড়েন্দ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় গৌড় নামটি তখন সমস্ত বাংলাদেশের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইত।" [৩]

গৌড়ের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে এবং স্বাধীন রাজা রূপে পালরাজের আবির্ভাব বস্তুতঃ গৌড়ের বল এবং পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের অভিলাষী ব্যাপক সংঘর্ষ এবং চালুক্যরাজদের আক্রমণে গুপ্তরাজদের দুর্বলতার সুযোগতে ঘটেই। গৌড়ের উন্নতির মূলে পালদের — অবদান চিরদিন কীর্তিত হবে। এমন স্বাধীনচেতা এবং বিদ্যোৎসাহী নৃপতি গৌড়ের শাসক না হলে গৌড় বোধ হয় এত সমৃদ্ধশালের পরিচয় হতে পারত না।

পালদের পর প্রায় একশ বছর গৌড়ের উপর দিয়ে বয়ে গেছে দুরাকাঙ্ক্ষার ঝোড়। এই একশ বছরের ইতিহাসকে দুর্যোগের ইতিহাসই বলব। শাসন নেই, শান্তি নেই, নিয়ম নেই, শৃঙ্খলার পরিবর্তে তাই। এর বহু বৎসর পর মুক্ত হয় রাজা গোপালের হাত যখন গৌড়ে আবার সুশাসন ফিরে আসতে শুরু করেছে। পালযুগে শান্তি ফিরে এসেছে। বাঙালী মুক্তি পেয়েছে। রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশও অভিন্নতা করেছে। মুক্ত গৌড়বঙ্গের পালরাজা দের আমলে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ দেখা গেছে গৌড়ের। রাজনৈতিক বিপর্যয় যা এসে দেশের লোকের মনে শিল্প চেতনাবোধে বাধা আসেই। চিত্ত শুদ্ধির যা হলে সংস্কৃতি হয় বিলুপ্ত।

---

৩. চট্টোপাধ্যায় অমলা কুমার / প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়। বন্দ্যোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী কুমার / লোকনাথ পুস্তকালয় ১৩৬৩। তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পৃষ্ঠা ৫ — ৬।

পালযুগ গৌড়বঙ্গের সমৃদ্ধির যুগ – সংস্কৃতি চেতনার উৎকর্ষের যুগ। বস্তুত গৌড় শুধু একটি ভূ-খণ্ডই ছিল না। বাংলাকে জানতে হলে, বাঙালীকে জানতে হলে, বাঙালীর সৃষ্টি এবং ধর্মকর্মসহ জানতে হলে গৌড়ের ঐতিহ্যময় ইতিহাসকে জানতেই হবে।

একটা ধারণা চিরন্তন সত্য বলে মেনে নেওয়া ভাল যে পুরাকীর্তি এবং গৌড় সমার্থক শব্দ যা সাধারণভাবে করা হয়ে থাকে। পালরাজাদের আমলে গৌড়ের যে সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা আর কখনও ঘটে নি। প্রাচীন গৌড়ের এত যে সমৃদ্ধি, এত যে বৈভব তার শিল্পের – কারণ কি? যে কোন উন্নতিশীল দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তিনটি বস্তুর শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষিকে অবলম্বন করে। বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে গৌড় পেয়েছিল কজঙ্গীকে, পেয়েছিল পলাশকে, পুনর্ভবাকে এবং আত্রেয়ীকে। পরবর্তীকালে মহানন্দাও গৌড়ের বাণিজ্যকে সমৃদ্ধির পথ তরান্বিত করেছিল। এই নদী সমূহের কূল বাহি ধারা গৌড়ের মৃত্তিকাকে করেছিল উর্বর এবং শস্যসম্পদে পূর্ণ হওয়ার যোগ্যতা দান। নদী পথবাহিত পলিমাটী গৌড়কে কৃষিযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি দেখা দিতে শুরু করে – শুরু হয় বাণিজ্যিক লেনদেনের। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্ত, ওদন্তপুরী, বর্ধমানভুক্তি প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বলে শুরু করে। এই সমৃদ্ধির জন্যই বাঙ্গালীর নানা অঞ্চল থেকে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে লোক এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং তার ফলে এই অঞ্চলে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব পড়েছে এ অঞ্চলে প্রচলিত কথ্যভাষার উপর। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য ছিল। আচারগত এবং সংস্কৃতিগত ব্যবধানও ছিল। তবু সুদীর্ঘ দিন একই স্থানে বসবাসের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রণ ঘটতে শুরু করে। ফলে ভাষারীতির মধ্যেও একটা আদান প্রদান চলতে থাকে। বাঙ্গালীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং এত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এখানকার লোকদের মধ্যে যে একটা সহজ সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে তাও অবহেলার যোগ্য নয়।

প্রাচীন গৌড় যে শুধু কৃষিসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল তা নয়। কৃষিজাত দ্রব্য ছাড়াও গৌড় যে কারণে লক্ষ্মীর সৌভাগ্য এবং মর্যাদায় চিহ্নিত হয়েছিল তা তার শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি। হিউয়েন সাং এর বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে গৌড়ের জনসাধারণের শিক্ষার প্রতি একটা স্বাভাবিক আগ্রহবোধ ছিল। জনসাধারণের মধ্যে তখন বাগবিধি প্রীতি ও বাদোদ্যমোদের প্রচলন ছিল। সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয় শিল্প তখন গৌড়বাসীর

স্বাভাবিক অনুভূতি দেখা যেত।

সাহিত্যে পালযুগ একটি বিশিষ্ট অধ্যায় রচনা করে আছে। পালযুগের ভাস্কর্যের প্রভাব করে বৈষ্ণব সাহিত্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, বাংলা গ্রন্থলিপি আজও ঘোড়ারানী বা হস্তির অঙ্কন করতে মুক্ত করেছে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, বেদান্তবিদ্যা বিদ্যাস ব্যক্তি গণের মতা অনুভূত করেছেন। বাবেন্দ্রভূমি হিসেবে পালভাস্কর্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই পালভাস্কর্যের মূলকেন্দ্র পালযুগেই। মূর্তিগুলি ধীরস্থিরভাবে। ঘোড়াগাছিবিগ্রহটি "ঘোড়াগাছ কার্তিকের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অধিবাসী প্রজাপতি মহীপুর গ্রাম সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত" কাব্য পালযুগের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠে প্রাচীন ঘোড়ের সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রাচীন ভারতের বহুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিদ্যালয় একটি নাম। এই দীপঙ্করের জন্ম ঘোড়ারাম পরিবারেই। কাশ্মী শিল্প প্রাচীন ভারতের মাতৃ একটি প্রসিদ্ধ নাম। ইনি ছিলেন বিক্রমপুর বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য। কাশ্মী শিল্পের বাড়ী ছিল ঘোড়েই। সিংহী ও মারমী তন্ত্রের চৌরাশিসিদ্ধের মধ্যে ঘুণী ভাদের অন্যতম ছিলেন ঔদন্তপুরী। ইনিও ঘোড়ের অধিবাসী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রজাপতি নাকী ভাদের স্বাধ করি পণ্ডিতবর অন্যতম গুরু। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না — ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইনিই বিক্রমশীল মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। "ভ্রমপাপি বিনয়" গ্রন্থের রচয়িতা অসাধারণ প্রতিভাধর কবি মহীধর ঘোড়ের অন্য একাদশ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। "পারিজাত-মঞ্জরী" নাটকের রচয়িতা মদন এবং "ঘোড়ের মুকুটমণি" নামে খ্যাত গণপতি এই ঘোড়েরই অধিবাসী।

অধ্যাপক শাস্ত্রী ভাদর এবং নন্দী দুই বিতর্কিত আলোচনা করেছেন ঘোড়ী রীতির কথা আলোচনা করেছেন ঘোড়ী রীতির কথা বাদ দিলে চলে না। প্রকৃতপক্ষে এই ঘোড়ের নামের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট কাব্যরচনা রীতির প্রবর্তন যুক্ত হয়ে যায়। সেই রীতি ঘোড়ের চারণকবিদের গতীতেই আবদ্ধ থাকে নি — তা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা আর্যাবর্তেই। ঘোড়ী রীতির উদ্ভব প্রসঙ্গে বিদ্যের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য।

"এই ঘোড়ী রীতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক হইতে গভীর অর্থবহ।.....ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই ঘোড়বাসীরা বিদ্যের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে থাকুন করেন, আর তাহার ফলাফলাদিতে তাহার প্রথম প্রমাণ। শতাব্দে আসিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের ধারণা একটি সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে

এই দোতলা কুল গাছ করিল দোতুরী তিতে সর্বভারতীয় বৈদান্তী বৌদ্ধির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন মৌলিক বৌদ্ধির উদ্ভব ও বিকাশে। মনের মাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ - ঘটিয়াছিল দোতুরনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী।"[৪]

পালযুগের দোতুরোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হতে না হতেই শুরু হয় সেনযুগ। দোতুর ইতিহাসে দোতু সমৃদ্ধির যুগে সেনযুগের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে। শুধু রাজাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এ যুগের গতীয় নয় - সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও সেনযুগ একটা দোতুরোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

সমাজসেন দোতুর সিংহাসনে বসেছিলেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। দোতুর অসম্পূর্ণ উন্নতি সেবা দিয়েছিল সমাজসেনের আমলেই। তাঁর নাম সেন "ব্রতসাগর" "দান সাগর", "আচার্যসাগর", "অদ্ভুতসাগর", "প্রতিষ্ঠাসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সমাজসেন তাঁর নামেই কবিত্বশক্তি অর্জন করেছিলেন। ধোয়ী, উমাপতি, গুরু, শরণ, গোবর্ধন এবং জয়দেব সমাজসেনেরই রাজসভার কবি। সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণাটদেশে। তাঁরা ছিলেন কর্ণাটবাসিয়। প্রাচীন দোতুর রাজন্য করার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাটদেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাও তাঁরা এ দেশে নিয়ে এসেছিলেন।

দোতুদেশে এসেছে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভবের ঢেউ। এসেছে জৈনধর্ম, এসেছে শৈবধর্ম, এসেছে ব্রাহ্মণধর্ম, এসেছে ইসলামধর্ম, দোতুর সংস্কৃতির এবং দোতুবাসীর জীবন ধারার পরিপুষ্টির দেহনে এই সব ধর্মের মূল্যপ্রকারী প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না। পালযুগে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হতে শুরু করে, তার কারণ পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। সেজন্যই বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য পালরাজারা সব দিয়েছিলেন। পাল রাজাদের যুদ্ধ-কালে যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল সেনরাজাদের আমলে তার প্রভাব কমতে - থাকে এবং বিষ্ণুধর্মের অভ্যুত্থান শুরু হয়। বিশেষতঃ শৈব ধর্মের। এরই সঙ্গে শৈবধর্মও কালক্রমে এদেশের জীবনধারায় "ধীর গতিতে শুরু করে। সেন রাজত্বের শেষের দিকে মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দোতুর জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের হয়েছিল তা বেশ কিছুদিন স্থায়ী ছিল। কালক্রমে যখন মুসলমানরা এসে দোতুর শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছে এবং ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

---

৪. ডঃ নীহাররঞ্জন / বাঙালীর ইতিহাস। ঐ জ্যোৎস্না সিংহরায়। মাঘ ১৩৫৬/ দেব সমবায় সমিতি কলিকাতা - ২৬ / পৃ ৩৬১

78290
T JUN 1982

অষ্টাদশ শতকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের শিরোনামে মোট ১৮ বার। এই সময়ে ইতালির সংস্কৃতি বা সাহিত্যের তেমন উন্নতি দেখা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। সিংহাসন নিয়ে মারামারি, রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি এবং ক্ষমতা নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা মেতে উঠেছে। ফলে সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং শিল্পচর্চায় এ যুগে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে। তারপর মোটের অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মোট আবার সুবর্ণযুগে ফিরে আসে। এই শতাব্দী থেকে মোটের জীবন আবার সবদিক থেকেই সাংস্কৃতিক বলে শুরু করে। শিক্ষা সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য রচনা, শিল্পকলা সবকিছুই তখন আবার নতুন চেতনা নিয়ে জেগে উঠতে শুরু করে। শতাব্দীর শেষে সুলতান সবকিছু সাফল্যের দিকে বহন করে নিয়ে দাঁড়িয়েছে আমলের মোট এবং পাণ্ডুয়া।

ইতিহাস বলে লোরেন্স সাহেবের আমলে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার পথ খুলে যায়। অর্থাৎ অনুমান করতে পারি মোটে প্রচলিত নানাধরনের ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার মর্যাদিকার স্বীকৃত হয়েছিল। আরও জানা যায় যে লরেন্স সাহেবের আমলেই কুল গোস্বামী "ঔষধ কী নবমি" রচনা করেন অর্থাৎ ঐতিহ্যগুলে সংস্কৃতভাষায় যে চর্চা গড়ে উঠে তা এই ঘটনা থেকেই জানা যাচ্ছে।

নবাবী আমলে শ্রী চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের যে উদ্ভব ঘটে এবং বৈষ্ণব - সাহিত্য রচনার প্লাবন যে সূত্রপাতেই মোটে তার প্রভাব এসে পড়ে। চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কাব্য গুলো বাংলাভাষায় এবং মার্জিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এর থেকেও বোঝা যায় বাংলাভাষা অন্যান্য ভাষারই ভিত্তি উপরে দাঁড়িয়ে আছে এ যুগে। যদিও মোট তখন নানাভাষাভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত তবুও বাংলা ভাষাই ছিল মুখ্যভাষা। অর্থাৎ নবাবী আমলেও দেখা যাচ্ছে মোটে প্রচলিত বিভিন্ন কথাভাষার মধ্যে তৎকালীন বাংলাভাষা আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে যে বাংলা ভাষায় তখন থেকে বিদেশী শব্দ বিশেষত আরবী এবং ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে। এই ভাবেই বহু ভাষাভাষী অঞ্চল বিশেষের একদিকে যেমন মোটের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে - অন্যদিকে তেমনি সাংস্কৃতিক কারণে বাংলাভাষাও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন দেশটের উপর এসেছে বিভিন্ন ধর্মের অভিঘাত এসেছে বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন বর্ণের লোকের ভীড়। যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্ন বর্ণের সমাগমে প্রাচীন দেহে ঐতিহ্যময় স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমে বিভিন্ন জাতি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল। সমাজ সংস্কার করাও বিভিন্ন সামাজিক নির্দেশ, বিধি নিষেধ এবং আচরণীয় বিধানের মাধ্যমে এক জাতিকে অপর জাতির সংমিশ্রণ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে সেই বিধিনিষেধের বেড়া ভেঙে যায়। ফলে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নীচু বর্ণের মিলন ঘটতে সুরু করে সব কালে। মানবের ধর্মনিয়ম এই পারস্পরিক মিলনেরই সংস্কৃতি। কিন্তু কোন যুগে কোন সময়ে কোন উচ্চ বর্ণের সঙ্গে কোন নীচু বর্ণের সংমিশ্রণ হয়েছিল তথ্যসূত্র-পত্র নির্দেশ কোন কোন পাওয়ার যুক্তি গ্রন্থে খোঁজ করে পাওয়া যাবে না - এখন পর্যন্ত অনুসন্ধান যায় নি। কুলজী গ্রন্থমালায় যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা পুরোপুরি ঠিক নয়। বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথা সুরু হওয়ার বহু পূর্বে বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। শ্রীজীবগোস্বামী, অদ্বৈতমল্ল আচার্য প্রভৃতি আচার্যরা বলেছেন এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে যে প্রাচীন দেশটিতে বিভিন্ন বর্ণের লোক বাস করত। পঞ্চম শতকে ও অষ্টম শতকে প্রাচীন দেশটে ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল একথা পাশ্চাত্যরা স্বীকার করেছেন। যাদের চেনার বিভিন্ন ধারায় এবং বিভিন্ন গ্রামে আজও চাষা, ভোম, শবর, পুলিন প্রভৃতি অন্ত্যজ বর্ণের লোকদের বসতি লক্ষ্য করি। এরা সেই প্রাচীন দেশবর্ধনের যুগ থেকে এখানে বসবাস করে চলেছে। সকল বলাই বাহুল্য এদের ও ছিল নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষা এবং এরা এদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে বসবাস করে আসছে। রাষ্ট্রগঠনে বিভিন্ন জাতির পরোক্ষ দান অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালে সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক যেমন ছিল ব্রাহ্মণেরা তেমনি সমাজের ভিত্তিভূমিতে শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তুলতে ব্রাহ্মণদের জাতিদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল খুব সহজ কারণেই। প্রাচীন দেশটের সৃষ্টি ও সভ্যতার চরম মুহূর্তে যারা তারা ভিন্ন সকলেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক। মন্দির নির্মাণে, মসজিদ নির্মাণে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণে, দীঘিকা ও পুষ্করিণী খননকার্যে, জনাবাদী জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে, শিল্প সামগ্রীর প্রসারের কার্যে, বাণিজ্যিক লেনদেনের কার্যে, চারুকলা নির্মাণে, স্থাপত্য সৃষ্টিতে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। একথা স্থিরনিশ্চয় যে তারা জাতিবর্ণের গণ্ডির বাইরে নয়। তারা ব্রাহ্মণেরই জাতি। প্রাচীন দেশটের

চরম উৎকর্ষের শেছনে তাই অন্যান্য শ্রেণীর ,পণ্ডিত শ্রেণীর এবং ব্রাহ্মণের সম্প্রদায়ের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে । এখনও মালদহ অঞ্চলে উচ্চ বর্ণের তুলনায় নীচু বর্ণের লোকের সংখ্যা বেশি।এর কারণ আর কিছু নয় - ব্যবসায়িক কারণে, রাজনৈতিক লেনদেনের কারণে, নগর নির্মাণে ,দেশ দেশান্তর থেকে যারা গোড়ায়দিকে এসেছিল - বংশানুক্রমে তাদের শাখা আরও বেড়ে গেছে । তাই মালদহের বিভিন্ন ভাষায় আমরা দেখি বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বর্ণের ,বিভিন্ন জাতির সমাবেশ । যুগে যুগে এরাই সৃষ্টি করে চলেছে বিভিন্ন ভাষার - বিভিন্ন উপভাষার জন্ম দিয়েছে এরাই ।
মালদহ জেলার প্রতি ভাষায় বিভিন্ন গ্রামে বসবাস আছে বিভিন্ন জাতির,বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন উপবর্ণের বাস । জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে যে সব জাতিদের পরিচয় পেয়েছি তার বিবরণ নীচে দেওয়া হল ।
ইংরেজবাজার ভাষা ঃ - পুরকায়স্থ, মালো, কংসবণিক, ঘোষ, মাপিত, কামার কুমোর, সূর্তিয়ার, তাঁই তন্তু এবং তন্তী সম্প্রদায় প্রভৃতি ।
পুরাতন মালদহ ঃ - মাপুরুত্যুলিয়া (অনুবাদ) ,ঘোষ, মাপিত, সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক , মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ।
লোকনাথপুর, বালুটোলা, আড়াইআনা, ধরমপুর , কদমতলা, মাঝিরপুর, মাপিকচক প্রভৃতি এলাকায় সৈখিল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বসতি সবচেয়ে বেশি । এ ছাড়া ঘোষ,মাপিত কামার, কুমার মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকদের বসতিও লক্ষ্য করা যায় ।
হবিবপুর, রামনগোলা এবং বামোল ভাষার অন্তর্গত গ্রামগুলিতে রাজবংশী , পোলিয়া কোচ, মহাশুদ্র,লোহার ,মাওতাল, ওরাও, মাহাতো, রুয়া, ঘোষ মাপুরুত্যুল, মুসলমান, কোড়া, তাঁতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকবসতি দেখা যায় ।
মাপিকচক অঞ্চলে মুসলমান, শিব ,কামার ,শিল্পকার তাঁইসমাজ, ঘোষাল, মাপুর,তামুলী , সৈখিল, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকের বসতি আছে, কিছু কিছু এলাকায় ব্রাহ্মণ কায়স্থদেরও বসতি লক্ষ্য করা যায় ।

পোড়ের পুলনাবলেষ যেখানে আছে সেই সব অঞ্চলে অন্যান্য শ্রেণীর লোকবসতি দেখা যায় । এ সব অঞ্চলে মালপাহাড়ী ,পাহাড়িয়া, রায় ঘাটোয়াল, সাগর তাঁতী প্রভৃতি জাতিদের বসতি লক্ষ্য করা যায় । এ ছাড়া এ জেলায় আরও ভিন্ন শ্রেণীর জাতির যে সব পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে বাউরী ,হুঁইমালী, রুবিদাস, ঘাসী , বাঁড়ী রাজিয়া বৈষ্ণব ,ব্যাওরা, চন্ডাল, বাদ, মুদাবার, মুচিয়া, ধোপা, ভিখোরু,ছুরী ছুতারী মাঝারা ভার ,তাওয়ার গাবেরী চাপোটি পাটোয়ার কুড়িয়া, ঘোড়াদিয়া মুরারী, মালো -

বাতেরাম্বার, পার্বত্যজ্ঞ ,তোরাবা, ভোল, বাগার, বুড়ি ,ছাড়ী ,চাল, মেলে, বাড়ুরাই কাতোল প্রভৃতি প্রধান ।

এবারে একটা তালিকা মাধ্যমে মাগদল জেলার বিভিন্ন ভাষাভাষী দের কথ্যভাষার একটা তালিকা দেবার করে ।

ছক ...১

অঞ্চল	কথ্যভাষার রূপ	ভাষাভাষীর পরিচয়	ধর্ম
লোভানপুর, বালী টোলা, আড়াইডাঙ্গা, ধরমপুর — চৌকী, মাঝিচর	চৈকিকী বাংলা	চৈকিক সম্প্রদায়	হিন্দু
কালিয়াচক, সুজাপুর, জালালপুর, মাঝিচর, কুমারগঞ্জ, কদমতলা	আরবী ফারসী মিশ্রিত বাংলা	মুসলমান	মুসলমান
ইংরেজবাজার, মালিয়া, রায়দরপুর, মীরচক, কলিগ্রাম	আরবী ফারসী মিশ্রিত বাংলা	মুসলমান	মুসলমান
হবিবপুর, বামন গোলা	ঐ-সম্প্রদায় কর্তৃক কৃত পিডগ্রাম অঞ্চলিত বাংলা	রাজবংশী চোচক, গোলিয়া	হিন্দু

অঞ্চল	কথ্যভাষার রূপ	ভাষাভাষীর পরিচয়	জাতি
গড়ানন্দপুর, মহাবন-টোলা, বুড়ো নগর, বিদ্যাসাগরী, ভুতনী, অমৃতি	হিন্দী - মিশ্রিত বাংলা স্থানীয় অঞ্চলে এই প্রকারের ভাষাকে চলতি ভাষা বলা হয়ে থাকে।	চাঁই মণ্ডল, দোয়াদ, নাগরমণ্ডল, কাহার, বিন্দ, ডিয়োর, মার্কণ্ডেয়, চাষোট	হিন্দু
পুরাতনী, খাইচরা মহসীপুর, মোক্ত খাসলা, চিপাবাসী খাড়াপুর	পুরা সম্প্রদায়ের ভাষার সংযোগে এবং স্থানীয় ভাষার - সংযোগে হয়ে বাংলা ভাষা।	পুরুষিয় সম্প্রদায়	হিন্দু
খুলনপুর এবং কলিয়াম	কলমবন্দি সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ভাষা	কলমবন্দি সম্প্রদায়	হিন্দু
বড়িসমপুর, তুলসীবাড়ী, নাকনী	গদেশ, দোসিয়া, ডিয়োর, ডিমি সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত মাতৃভাষার সংযোগে হয়ে বাংলা ভাষা।	গদেশ, ডিয়োর সম্প্রদায়	হিন্দু
নাকনী	বাসুরী- নাকনী মিশ্রিত বাংলা ভাষা	মুসলমান সম্প্রদায়	মুসলমান

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে, গ্রামে, গঞ্জে যে বিচিত্র ধরনের কথ্যভাষা ছড়িয়ে রয়েছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।